সংবাদ

তারিখ ... 06 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিয়ে এখনি ভাবার সময়

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

বেশ ক'দিন ধরে একটি বিষয় নিয়ে মনের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করছি, একবার ভাবি কলম নিয়ে বসে যাই, কিছু লেখি, আবার ভাবি প্রকাশ করে কী হবে? পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন তো অনেক খবরই বের হয়, তাতে কার কী আসে যায়, তবুও লেখক মনের তাড়নায় কলম ধরতে বাধ্য হলাম। এই তো কয়েক মাস আগে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে সমকালে লিখলাম, লিখলাম দেশের আরও কয়েকটি স্বনামধন্য জাতীয় দৈনিকে, কী হলো! অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল, বদলানো শুধু এই রমরমা বাণিজ্যের ধরন। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন করার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রুল জারি করেছে নিজ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ক্লাস ছাড়া বাসায় নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পড়ানো যাবে না। তবুও দেশের আনাচে-কানাচে এই বাণিজ্য বন্ধ করা যাচ্ছে না। আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে থেমে নেই তাদের প্রাইভেট বাণিজ্য। আমার বাসা থেকে বেরোলেই মাত্র কয়েক মিনিটের পথ সদর রাস্তার ধারে থাকেন একটি সরকারি কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক। সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলাই পড়ান নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের। পাঠক এবার নিশ্চয়ই বলবেন না যে, এই সহকারী অধ্যাপক আইন সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি সবই জানেন, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের নেশায় আইন মানতে চাচ্ছেন না। আমি যে শহরে থাকি এ শহরেই রয়েছে দুটো নামকরা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয় দুটোর বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, তাছাড়া আমি নিজেও একজন শিক্ষক। সরকারি কলেজের মতো এখানেও সেই একই অবস্থা। কাগুজে আইন আছে, কিন্তু কোন বাস্তবায়ন নেই। অতিরিক্ত ক্লাসের নিয়ম মেনে কেউই চলছে না। যারা নিয়মের আওতায় শিক্ষকদের নিয়ে আসবেন তারাই অনিয়মের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য সরকার প্রতি বিষয়ের জন্য ২শ' টাকা ফি নির্ধারণ করেছে। এই নিয়মটা মফস্বল শহরে অনেকেই মেনে চলছেন, তবে মাত্র দুটি বিষয় পড়িয়ে ৫০০ টাকা নিচ্ছেন অনেক প্রতিষ্ঠানেই। বিদ্যালয় অতিরিক্ত ক্লাস থেকে টেন পারসেন্ট হারে সে টাকা পেয়ে থাকেন তা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে, কিন্তু আজব ব্যাপার হলো প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ক্লাস চলছে অথচ প্রধান শিক্ষকদের কাছে এ ফান্ডের কোন হিসাব নেই। এটা অনেকটাই ব্যক্তিগত ফান্ডে পরিণত হয়েছে। কোন তদন্ত হলে নিজেদের বাঁচার জন্য হয়তো বলে দেবেন তাদের প্রতিষ্ঠানে কোন অতিরিক্ত ক্লাস হয় না। তাই শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা যেমন হিসাব করে টাকা নিচ্ছেন না, তেমনি শিক্ষকরাও টাকা দিতে আগ্রহ বোধ করছেন না, কারণ তারা জানেন এ টাকা প্রধান শিক্ষকদের পকেটে চলে যাচ্ছে। একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা গেল প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক একেক ক্লাসের জন্য একেক ধরনের ফি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোন ক্লাসের জন্য দুই হাজার, কোন ক্লাসের জন্য তিন হাজার, আবার কোন ক্লাসের জন্য এক হাজার। কোনোটাই শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিবেচনায় নয়, যার সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের যেমন ভাব তার ফি-ও তেমন। পরিচয় ভালো হলে টাকার অংক কম। বিধি মোতাবেক শিক্ষার্থীর সংখ্যা চল্লিশজনের কথা উল্লেখ থাকলেও এ নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। কোন কোন অতিরিক্ত ক্লাস ঠিক যেন শ্রেণীকক্ষের মতো অবিকল আরেকটি ক্লাস। এক অভিভাবক জানালেন কোন কোন শিক্ষক অতিরিক্ত ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলাদা করে আবার স্পেশাল ব্যাচ খোলেন, পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বাসায় এদের মধ্য থেকে অতি উৎসাহীদের নিয়ে নতুন করে আরেকটা ব্যাচ শুরু করেন। ভাবুনতো পাঠক, একজন শিক্ষকের আদর্শের কতটা পতন হলে একমাত্র টাকার লোভে শিক্ষার্থীদের নিয়ে এভাবে খেলতে পারেন। কোন যুক্তিতে একজন শিক্ষক একই শিক্ষার্থীকে একই পড়া দিনে তিনবার কিভাবে পড়ান? কেন পড়ান? আমার বন্ধু জনাব আমিনুল ইসলাম আক্ষেপ করে জানালেন, দোস্ত কী আর করব? একটি মহান পেশা মনে করে শিক্ষকতায় এসেছিলাম, কিন্তু আসার পরে বুঝতে পারলাম, কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। যে যত বেশি অতিরিক্ত ক্লাস নিচ্ছে অভিভাবকরা তার কাছে তত বেশি ভিড় জমায়, কার প্রশ্ন কত বেশি কমন পড়ে সেটাই মুখ্য বিষয়, অভিভাবকদের এক ধরনের মানসিকতাই তৈরি হয়েছে বেশি নম্বর কিভাবে পাওয়া যাবে, তাদের ছেলেমেয়ে কতটুকু জানল তা অনেক অভিভাবকই ভাবেন না। তাই কী আর করব বাধ্য হয়ে দু-চার পয়সা ইনকাম করতে হচ্ছে। নতুন চাকরি মাইনে যা পাই তা দিয়ে চলতে কষ্ট হয়। তাইতো একটা অতিরিক্ত ক্লাস নিচ্ছে দু'জনে মিলে। যা পাই, তা দিয়ে ভালোই চলে যায় দিন। স্টুডেন্ট সংখ্যা চল্লিশ কথা থাকলেও সংখ্যা কিছুটা বেশি, আমার সঙ্গে যে আছেন তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বললেও তিনি বুঝতে চাচ্ছেন না, তাই বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে মিল রেখে চলতে হচ্ছে। মফস্বলের অনেক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চরমে। ডাবল শিফটের বিদ্যালয়ে বায়ান্নজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও মফস্বলের অনেক বিদ্যালয়ে পদ শূন্য রয়েছে। কোন কোন ডাবল শিফটের বিদ্যালয় মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশজন শিক্ষক নিয়ে চলছে। একটানা তাদের ক্লাস নিতে হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে ক্লাসরুমের সংকট রয়েছে, পুরাতন ভবনগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে, অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস করতে হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকেরা। বিদ্যালয়গুলোতে বেপরোয়াভাবে চলছে ভর্তি প্রক্রিয়া। আলাদা কোনো সেকশন নেই। একশ'র অধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে চলছে প্রতিটি ক্লাস।

অবাক হবার মতো বিষয় এমনই পরিস্থিতিতে এক ধরনের শিক্ষকেরা প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে রুম বরাদ্দ নিয়ে ক্লাস চলাকালীন বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত ক্লাস নিচ্ছেন, এতে শ্রেণীকার্যক্রম যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমন শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রেণীকার্যক্রমে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের উদাসীনতা। অথচ মফস্বলের অনেক বিদ্যালয়ে কোন রিডিং রুম নেই, নেই কোনো পত্রিকা রুম, না আছে মানসম্মত কোন লাইব্রেরি। এসব লাইব্রেরিতে বই বলতে যা আছে তা শুধু ময়লার আস্তরণে ভরা।

তবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেক বঞ্চনার কথাও রয়েছে। সহকারী শিক্ষক জানে আলমের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি করছেন প্রায় ২০ বছর। এখানে প্রমোশনের কোন ব্যবস্থা নেই। যে পদ থেকে চাকরি জীবনের শুরু আবার সেখানেই সমাপ্তি। সরকার বিগত কয়েক মাস আগে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে যে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ৮ বছর পূর্ণ হবে তাদের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হবে এবং তাদের পদমর্যাদা হবে সিনিয়র শিক্ষক। কিন্তু নতুন পে-স্কেল ঘোষণায় যেহেতু প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী বলে কোন কথা থাকছে না, সুতরাং আট বছরান্তরে তাদের যদি অষ্টম গ্রেডে উন্নীত করা না-হয় তাহলে তারা চরম বৈষম্যের শিকার হবেন। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি তাদের যেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, মাধ্যমিক জেলা শিক্ষা অফিসসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের যে বিভাগগুলো রয়েছে সেখানে যেন তাদের যাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষকদের থেকে বারবার এরকম দাবি উঠছে, মাধ্যমিকে প্রশাসনিক পর্যায়ে যারা এখন রয়েছেন তারা অনেকেই বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার থেকে এসেছেন তাই তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে তেমন একটা ভাবছেন না।

তিনি আরও বললেন, চাকরিতে প্রবেশ করেই আমরা এক ধরনের হতাশায় ভুগি, আমরা ধরেই নিই, যে পদে আছি সেই পদেই থাকতে হবে। ২০১১ সালে চাকরিতে যোগদান করেছি, বর্তমান সরকার ২০১২ সালের ১৫ মে আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করল। বর্তমান নতুন পে-স্কেল ঘোষিত হওয়ায় মাত্র কয়েক মাসের জন্য সিলেকসন গ্রেডটাও পেলাম না। একই পদে চাকরি করে কেউ আছে ষষ্ঠ গ্রেডে, কেউ সপ্তম, আবার কেউবা দশম। সর্বশেষ তিনটি ব্যাচে যারা যোগদান করেছেন তারা কোনভাবেই পুরাতনদের ধরতে পারবে না। তাই সর্বশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দাবি বর্তমান সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রোমার্জন বিধানের আওতায় এনে তাদের ক্ষতির দিক বিবেচনা করে এক বছর প্রোমার্জন করলে তারাও এ ক্ষতির হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে পারেন।

কলেজের একজন শিক্ষকের সহকারী অধ্যাপক হতে প্রায় ২৫ বছর সময় লেগে যায়, অথচ তিনি যদি পিএইচডি ডিগ্রিধারী হন তাহলে মাত্র ১২ বছরের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন, কিন্তু সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যদি কেউ পিএইচডি ডিগ্রিধারী হন তাহলে তিনি কোন ডিপার্টমেন্টাল সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। প্রশ্ন থেকে যায় যদি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা কোন সুবিধা ভোগ করতে না পারেন তাহলে কেন তারা গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন। একজন গবেষক ও একজন সাধারণ শিক্ষকের মাঝে যে কতটুকু পার্থক্য তা না বোঝার কথা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সহশিক্ষামূলক নানা কার্যক্রমে মাধ্যমিক স্তরের অবদান চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যখন জাতীয় দিবসে ছুটি ভোগ করে থাকে তখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটি থাকা সত্ত্বে তাদের সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করতে হয়, এরপরেও শিক্ষা ডিপার্টমেন্ট ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে বিবেচিত। বারবার বলা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করতে হলে মাধ্যমিক স্তরকে অবহেলিত রেখে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একসঙ্গে মাধ্যমিক স্তরকে অবহেলিত রাখব, আবার আশা করব শিক্ষার মান ভালো হোক। আর যা-ই হোক এটা কখনো সম্ভব নয়।

[লেখক : কথাসাহিত্যিক]